দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 24 NOV 1991 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষক মর্যাদা রক্ষায় আই. এল. ও

শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম

শিক্ষা জাতির অগ্রগতির নিশ্চয়তা দিতে পারে। শিক্ষার অগ্রগতি নির্ভর করে শিক্ষকদের মর্যাদা ও গুরুত্বের ওপর। বিশ্বব্যাপী এই স্বীকৃতি সত্যটির প্রতি বিশ্বব্যাপী অবহেলা চলছে বলে বিভিন্ন দায়িত্বশীল মহল থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের বহু দেশের বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর শিক্ষকের মান-মর্যাদার অবনতি ঘটার কথা জানা গেছে। বাংলাদেশে এই অবস্থা আরও হতাশাব্যঞ্জক।

পৃথিবীর অপরাপর দেশ এ বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ নজর দেবার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশেরও এ ব্যাপারে সক্রিয় হওয়া জরুরী জাতীয় বিষয়।

একথা সত্য যে, শিক্ষার মানোন্নয়নের যতগুলো উপাদান রয়েছে তারমধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষকদের সামাজিক মান ও বেতন-ভাতা ইত্যাদির প্রতি গুরুত্ব দেয়া। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর শিক্ষকদের আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদা তেমন মানসম্পন্ন নয়। ফলে শিক্ষকদের মধ্যেও নিজস্ব জ্ঞানদান পদ্ধতি তার বিকাশের প্রতি তেমন কোন আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না। অথচ একটি জাতির ভবিষ্যত শিক্ষকদের ওপরই নির্ভরশীল। জাতির সকল স্তরের সার্বিক মর্যাদা সৃষ্টির জন্য জনশক্তি তৈরী করে শিক্ষকবৃন্দ। এজনই আবশ্যক শিক্ষকদের মর্যাদা সমাজের সবার উর্ধে প্রতিষ্ঠিত করা। এ জন্য মাসিক ও অন্যান্য সাহায্য সমর্থন আবশ্যক। কিন্তু বাংলাদেশের বেলাতেই দেখা যায় এবং মনে করা হয় যে, একই সমান বেতন পদ ভোগীদের চেয়ে শিক্ষকদের অবস্থান অতি নিম্নে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour organisation—ILO)'র এক তথ্য জরীপে দেখা যায় একক খাত হিসেবে শিক্ষাখাতই বিশ্বের কর্ম সংস্থানের একমাত্র বৃহত্তম খাত। ১৯৮৮ সালের এক রিপোর্টে জানা যায় যে, পৃথিবীতে ৪ কোটি ৪০ লাখ শিক্ষক রয়েছে। এদের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষক রয়েছে অর্ধেকেরও অধিক। শিক্ষকদের প্রায় ৩/৪ অংশই অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে কর্মসংস্থান পেয়েছে।

বাংলাদেশে ১৯৮৮ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট শিক্ষকের পরিমাণ ৩লাখ ৯৪ হাজার ১ শত ৩১ জন। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক সংখ্যা – ২৬২২ জন (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত), মেডিকেল কলেজের শিক্ষক সংখ্যা – ৮৩২ জন, সাধারণ কলেজের শিক্ষক সংখ্যা – ১৯ হাজার ৭ শত ৬৫ জন, মাধ্যমিক শিক্ষক সংখ্যা – ১লাখ ২ হাজার ১ শত ৯৬ জন, মাদ্রাসা শিক্ষক সংখ্যা – ৭৯ হাজার ৫ শত ২৫ জন এবং প্রাথমিক শিক্ষক সংখ্যা ১ লাখ ৮৯ হাজার ১ শত ৯১ জন।

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার এক প্রতিবেদনে জানা যায় যে, ১৯৮০ সালের পূর্বের দুই দশক ছিলো শিক্ষক নিয়োগের দ্রুত প্রবৃদ্ধির দশক। তারপর থেকেই এই খাতে কর্মসংস্থান স্থবিরতা দেখা যায়। অবশ্য এই সময়ে কোন কোন দেশে শিক্ষক ঘাটতিও হয়ে গেছে, আবার কোন কোন দেশে উদ্বৃত্ত শিক্ষকও রয়েছে বলে তথ্যে জানা যায়। বহু দেশে শিক্ষক বেকারত্বও সবিশেষ লক্ষনীয়। বেসরকারী খাতে শিক্ষক সংস্থান করাটা এ সময়ে প্রায় বন্ধই থেকে যায়।

বিশ্বের জাতীয় আয়ের ৫.৫ শতাংশ ব্যয় শিক্ষাখাতে করা হচ্ছে এবং শিক্ষাখাতের এ ব্যয় ১৯৮৮ থেকে অব্যাহত আছে, এই ব্যয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকদেরকে ধরে রাখা। কিন্তু দশ বছরে বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যকার আঞ্চলিক বৈষম্যজনিত কারণে এই সংখ্যা ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া যে সংখ্যাটি বর্তমানে রয়েছে সেটিও সন্তোষজনক নয়। বাংলাদেশ দরিদ্রতর দেশ বলে এদেশেও সম্পদ সংকট রয়েছে এবং সেজন্য প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থার উন্নয়ন কিম্বা প্রয়োজনমত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কিম্বা শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। চলতি সালে শিক্ষাখাতে সর্বাধিক ব্যয় ধরা হয়েছে এবং গণশিক্ষা কর্মসূচীর আওতাধীন করে নেয়া হয়েছে এইডেড প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহকে। এতে প্রয়োজনের তেমন কিছুই দূর হচ্ছে না। এদেশে হাজার হাজার ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক এখনো কর্মসংস্থান পাচ্ছে না এবং তাদের কর্মসংস্থানের আশা-ভরসাও নেই।

উন্নত দেশগুলো তাদের শিশুদের বিদ্যালয়ে গমন যাতে বঞ্চনা হয় তার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তারা ইতোমধ্যে কতিপয় ব্যবস্থাও নিয়েছে। সম্পদ ব্যবহারে নিজ সম্পদ ও ব্যয় বিন্যাস করে নিচ্ছে।

অনুন্নত দেশগুলোতে (কোন কোনটিতে) এবং উন্নত অনেক দেশের এজন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা বা আধুনিক ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ বর্তমান। কিন্তু আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী মনে করা হয় যে এ বিষয়ে আবশ্যক।

নারী-পুরুষ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে দেখা যায় নারীরাই অধিক হারে শিক্ষকতায় সংস্থান পাচ্ছে। উন্নত দেশগুলোতে ১৯৮৮ সালের হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষায় মহিলা শিক্ষকই ৭৫ ভাগ। মাধ্যমিক পর্যায়ে এই পরিমাণ ৫৩ শতাংশ। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, টেকনিকেল (মাধ্যমিক) প্রতিষ্ঠানসমূহের বেলায়ও উল্লেখ করার মত মহিলা প্রধান নেই। খন্ডকালীন শিক্ষকতার জন্য গৃহীনি বা অগৃহীণী যুবতিরাই অধিক আগ্রহী এবং নিয়োজিত রয়েছে।

বলা হয়েছে যে, শিক্ষকদের বেতন ইত্যাদি সাধারণত অন্যান্য পেশার অনুরূপ শিক্ষিতদের চেয়ে কম। বে-সরকারী খাতের বেলায় এই পার্থক্য আরও বেশী। চাকরির নিশ্চয়তা, পেনসন, বার্ষিক ছুটি ইত্যাদি অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে বিবেচিত। বহু দেশে শিক্ষকদের বেতন ও সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্নকর অবস্থায় রয়েছে। ফলে সে দেশগুলোতে শিক্ষকতার পেশার প্রতি শিক্ষিতদের আগ্রহ কম এবং শিক্ষকদের মধ্যেও একটা নৈরাশ্য রয়েছে। কোন কোন শিক্ষক অপর কোন পেশায় যেতে পছন্দ করেন। কেউ কেউ শিক্ষকতায় সীমিত কাজ করেই কর্তব্য সম্পাদন করছেন।

বিগত দশকের শেষের বছরগুলোতে ছাত্রদের সাথে সরাসরি শিক্ষাদানের প্রকৃত সময়ও হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু শিক্ষকদের ওপর চাপ বেড়েছে। লেখাপড়ার প্রকৃতির বিভিন্নতার জন্যই এই চাপ বেড়েছে, একই শিক্ষকের ওপর বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করে তাকে চাপের সম্মুখীন করা হয়েছে। নিত্য নতুন আইন কানুন বিধি-বিধান সৃষ্টি করে তা শিক্ষকদের ওপর প্রবর্তন করায় তাদের কাজের আধিক্য বেড়ে গেছে। এ উন্নয়ন প্রচেষ্টা একটা ম্যারাথন দৌড়ের চরিত্র নিয়েছে। তারা শুধু থেমে থাকতেই চাচ্ছে।

শিক্ষা উন্নয়নে এসব নানা কারণে আশির দশক খুব একটা সহজ কিছু ছিল না। এ সময়ে অধিকাংশ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকবৃন্দ তাদের শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তেমন কোন পরিবর্তন বা উন্নয়নের সুযোগ পায়নি। পেশাগত অগ্রগতিও ছিল সীমিত। পদোন্নতি বা উচ্চতর পর্যায়ে বদলিও ছিলো স্থবিরতার মধ্যে প্রায়। বলতে গেলে তারা যেখানে কাজ শুরু করেন দশ বছর পর সেখানেই সেই স্তরে থেকে যান। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা পেশাজীবীরা ছিলো প্রায় হতাশারই মধ্যে।

ইউনেস্কোর সরবরাহকৃত তথ্যের উল্লেখ করে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা জানায় যে, এ সময় শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বয় সংকটই প্রধান হয়ে উঠেছে। এ জন্য শিক্ষকদের ইউনিয়ন কার্যক্রম জোরদার করাই ছিলো একটা প্রয়োজনীয় বিষয়।

শিক্ষকদের কর্মক্ষেত্রে কর্ম পরিবেশ, কর্ম বিষয় প্রভৃতি বিষয়েও ইউনিয়ন এবং নিয়োগকারী কর্তৃক (সরকারী ও বেসরকারী) সম্পর্ক উন্নয়নও ছিলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিটি ক্ষেত্র যেমন শিক্ষকদের বিষয়ে, শিক্ষা বিষয়ে, নীতি নির্ধারণে, পড়ানোর শ্রেণী কক্ষগুলোর পরিবেশ উন্নয়ন, উপকরণ, প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাচুর্য ইত্যাদিতে তাদের অংশীদারিত্ব ছিলো অত্যন্ত জরুরী বিষয়। এগুলোতে শিক্ষকদের সম্পৃক্ত থাকা কাজগুলোর অধিকাংশই প্রশাসনিক বিষয়ে প্রশাসনের ব্যস্ততায় অধিক সময়ই লেগেছে অবাধ্য এবং অদক্ষ শিক্ষকদের নিয়ে। কাজের চাপ বৃদ্ধিতে অধিকাংশ শিক্ষক রাত পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী কাজ করে যাচ্ছে। তাদের সাপ্তাহিক কর্মঘন্টা ৪০ ঘন্টারও অধিক। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মতামতে শিক্ষকদের ওপর থেকে কাজের চাপ কমানো উচিৎ। উন্নত দেশের প্রাথমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক ক্ষেত্রে এই বিষয়টির প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

সম্প্রতি বহু দেশ তাদের বহু সংস্কারমূলক নীতি গ্রহণ করেছে এবং সেসব নীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নীতি হলো শিক্ষাকে বে-সরকারীখাতে নিয়ন্ত্রণ করা বা পরিচালনা করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন মুনাফা ভিত্তিক নয় এবং ধর্মের সাথে শিক্ষার সমন্বয় সাধন। দেশগুলোর মধ্যে শিক্ষকদের কর্মসংস্থান এবং কর্মসূচীর সামঞ্জস্য নেই। এটাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা দরকার। বহু দেশের পরিকল্পনা কিম্বা বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দে যে ব্যবস্থা থাকে তা প্রয়োজনে আন্ত খাত অর্থ বিন্যাসের কারণ শিক্ষকের বেতন, ভাতাদি ক্ষতিগ্রস্থ হয় — এমনকি বন্ধও হয়ে যায়। শিক্ষক ইউনিয়নের দর কষাকষির ক্ষমতারও দুর্বলতা দেখা দেয়।

শিক্ষকদের এ অবস্থার প্রেক্ষিতে জেনেভায় আগামী ২০ থেকে ২৮ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় যৌথ আন্তর্জাতিক সম্মেলন। সম্মেলনে ১৬ সদস্য দেশের ১৬ জন প্রতিনিধি ও শিক্ষক নিয়োগকারী সংস্থার ৪ জন প্রতিনিধি, শ্রম সংগঠন থেকে ৩০ জন প্রতিনিধি যোগ দেবেন। সম্মেলনে শিক্ষকদের কাজ কার অবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষকতায় মানোন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং জাতীয় ক্ষেত্রে উন্নয়ন তৎপরতায় অবদান রাখার বিভিন্ন বিষয়ে বিবেচনা করা হবে।